আকাশ মায়া

ভবানী পাঠক

নবসাহিত্য নিকেতন
৩২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৩২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভাদ্র, ১৩৪৮

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪-৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এবং

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস

৫, চিন্তামণি দাশ লেন, কলিকাতা

আকাশমায়া

বাণ্টু ওঝার জয়

কাঁকরের ঢিবিটা কম উঁচু নয়। বাণ্টু ওঝা ছিল একে ক্লান্ত, তার ওপর বিমর্ষ। তবুও আস্তে আস্তে হামা দিয়ে উঠে পড়ল, কারণ এখানে আজ তার মস্ত একটা কাজ রয়েছে। বসে পড়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লে—আঃ।

চারদিকে ঘন জঙ্গল, শুধু এখানটাই একটু ফাঁকা। হাজার রকমের বড় বড় বাকলপরা গাছ, বুড়ো বুড়ো কাঁটাগাছ, শুঁয়াল অজগরে-লতা, ডালপালা নেই ঢ্যাঙা শীষের মত একরকম গাছ—এই সবে জঙ্গল ঠেসে রয়েছে। এক এক জায়গায় এগাছ থেকে ওগাছ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে ঝুলছে রাক্ষুসে মাকড়সার জাল; তাতে কবেকার বন্দী এক একটা ড্রাগন মাছি শুকিয়ে রয়েছে। মাঠটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গিয়ে ঠেকেছে জাম্বেসীর গভীর খাতের মাথার ওপর। খাত নেয়ে জলের তোড় গর্জ্জন করে চলেছে খরবেগে; সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যাচ্ছে কত গাছের গুঁড়ি, মাটীর চাপড়া, ছোট ছোট পাথুরে টিলা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জন্তুর কঙ্কাল আর হরিণের শিঙের ঝাড়। নদীর কাছাকাছি কতকগুলো

ফণীমনসার বাদাড়—তালগাছের চেয়েও উঁচু। তার পাশে মাটীর ওপর এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে একটা চমরী হাতীর টুকরো টুকরো হাড়। চামরগুলো উড়ে উড়ে বাদাড়ের গায়ে এখানে ওখানে সেঁটে রয়েছে।

এই ঢিবিটাই হল বাণ্টু ওঝার চৌদ্দপুরুষের গোরস্থান। তার বাপ ঠাকুর্দ্দা, তারও আগের আদ্দিকেলে যত বুড়ো ওঝাদের লাস চাপা রয়েছে এখানে। গোরের ভেতর তাদের কোন কষ্টের কারণ নেই; প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল ভাল কস্তুরী ষাঁড়ের সুগন্ধ মাংস, বন্যাহরিণের সোঁদাল মাংস, মিঠে বাহাদুর কচু, ভূঁই তরমুজ, চাকমারা মধু আর বাইসনের মুড়ো দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বড় বড় পাথুরে বল্লম, শিঙেল বল্লম আর কুমীরের চোয়ালের তৈরী শানানো কুড়ুল—এ সব দেওয়া আছে।

বাণ্টু ভাবছিল তবুও কি বুড়োবাবাদের কোন কষ্ট হচ্ছে? তাই কি রাগ করেছে তারা? নইলে আমার এত দুঃখু কেন? আমার ছেলেমেয়েগুলোকে সাপে খেল কেন? কেন বউকে গরিলায় গলা টিপে মারল? আমারই চেলা আর চাকরগুলো কিনা নায়েঙ্গার চোরাবালিতে ডুবে মরল?

চোখের জল মুছে বাণ্টু তার চুলের ভেতর গোঁজা বাঁশিটি বার করল। জিরাফের গোড়ালির হাড্ডির তৈরী দিব্যি মজবুত বাঁশি! খানিকক্ষণ ভক্তিভরে নাক দিয়ে ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে নিল; তারপর দুহাতে তুলে ধরল আর একটী বস্তু—যেটা তার সব আশা ভরসার, বিপদে আপদে রক্ষা পাবার—একমাত্র সহায়—সেই যাদুকরা সিদ্ধিকাঠি।

একটা আকাশ-খসা উল্কার পাঁচমিশালী ধাতু দিয়ে গড়া। খুব টেনে টেনে গম্ভীর স্বরে বাণ্টু মন্তর আউড়ে যেতে লাগল—

"হে, বুড়ো বাবারা মাপ করো,
তোমাদের কষ্ট তাই কষ্ট আমারো।
বুনো শোর তাড়া করে,   উটাঙে ভেঙচি মারে
ভূতেতে বেঁধেছে বাসা কিলি মান জারো
হে বুড়ো বাবারা মাপ করো॥
মরা ভালুকের মাস খেতে যদি যাই
হায়—কাঁকড়া বিছার এঁটো ছুটে যে পালাই
মড়কের ভয়ে মোমবাসা জড়সড়ো,
হে বুড়ো বাবারা মাপ করো॥
ভয়াল ময়াল সাপে,   পাকিয়ে থাকে যে ঝোপে
জাম্বেসী শ্যাওলাতে জোঁক হাজারো
হে বুড়ো বাবারা মাপ করো॥

বাণ্টু শেষে মন্ত্র পড়ল—

হি রুম্ ব, হু রুম্ ব।
রাট্টা দাট্টা বুদিনানা বুসিং,
মান্‌ঝা সেতুম্ সারেঙ্গা ঘুটিং,
রুম্ ব॥

হাঁটু দুটী মুড়ে মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে বাণ্টু ওঝা চুপ করে পড়ে রইল অনেকক্ষণ। আকাশে হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ হওয়াতে তার চমক ভাঙল। চোখ মেলে দেখে অবাক কাণ্ড।

আকাশে কতকগুলো পাখী উড়ে যাচ্ছে—শব্দ করে। এর আগে সে কখনো ওড়া পাখী দেখেনি। আগের মত সেই থমথমে ধোঁয়াটে কুয়াসা আর নেই, কোথায় উপে গেছে। আকাশটা কী নীল আর কত উঁচুতে! সূর্য্য তখন ডুবু ডুবু—বনের ওপর দিয়ে রাঙা আলোর জোয়ার গড়িয়ে আসছে। ফ্যাকাশে গাছপালার গায়ে রং ধরেছে—ফিকে সবুজ, ঘোর সবুজ। রুক্ষ কাঁকরে মাটীর মাঠ নরম ডুব্‌বো ঘাসে ছেয়ে গেছে। আরো দেখল, একটা পাথর-চাটা লতায় কচি পাতার চেয়েও নরম, নানা রঙে রঙীন কি একটা সুন্দর জিনিষ ফলে রয়েছে। বাণ্টু ওঝা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল—পৃথিবীর প্রথম ফুল।

আর সে বিমর্ষ নয়; আনন্দ শক্তি আর সাহসে তার বুক ভরে গেল। ফূর্ত্তির চোটে অধীর হয়ে সে নতুন ফুলটার গায়ে একেবারে চোখ নাক ঠেকিয়ে দেখে নিল। একবার দূর থেকে দেখল, একবার হাত বুলিয়েও নিল। তারপর লাফাতে লাফাতে গোর ঢিবি থেকে নেমে ঘরের দিকে বনের পথে ঢুকে পড়ল।

খুশীভরা মন, বাণ্টু ওঝা লম্বা লম্বা পা ফেলে বনের আঁকা বাঁকা সরু পথ ধরে চলেছে। সামনে একটা বেশ চওড়া জলকাদায় ভরা নালা পড়ল। চিতে বাঘের মত একলাফে নালাটা ডিঙিয়ে ওপারে পড়েই সে চমকে ফিরে দাঁড়াল। ও কি? বিপদের চিহ্ন? কাদার ওপর কার পায়ের দাগ? মানুষেরি তো বটে! পথছেড়ে বিপথে পায়ের দাগ, এ নিশ্চয় ভিন্‌বনের মানুষ।

বাণ্টু খুব সাবধানে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাতে লাগল। তারপর বুকে তাল ঠুকে হুঙ্কার দিয়ে তার ছুঁচমুখো হাড়ের বর্শাখানা

বাণ্টু মন্তর আউড়ে যেতে লাগল ····· হিরুম্ব

বাগিয়ে ধরে দাঁড়াল। শত্রুকে দেখতে পেয়েছে সে—ঐ যে লাল পাথরের ঢিবির পেছন থেকে তার কোঁকড়ান চুলের ঝুঁটি দেখা যাচ্ছে।

বাণ্টুর হুঙ্কারের প্রত্যুত্তর দিয়ে এক ভীষণ মূর্ত্তি জুলু রাগে গরগর করে নাক ফুলিয়ে পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। লতা দিয়ে বাঁধা এক গোছা পাথরের বেঁটে বেঁটে শাবল তার পিঠের উপর ঝোলানো, হাতে একটা বাচ্চা হাতীর দাঁত।

এদিকে নালার খাড়ি ধরে উঠে আরো ভীষণ লম্বাচৌড়া এক মানুষ মারমূর্ত্তি হয়ে একটু দূরে এসে দাঁড়াল। এ একজন হটেনটট্; তার হাতে মানুষের দুগুণ লম্বা চাঁচাছোলা গাছকাটা ডালে শুয়ারের দাঁত বসানো এক বল্লম।

তিন শত্রু তিন দিক থেকে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কে যে কাকে ছেড়ে কাকে আগে মারবে তারই ঠিক হচ্ছিল না। শুধু চলছে হুঙ্কার, চীৎকার আর লম্ফ ঝম্প। হঠাৎ মানুষের হুঙ্কার ডুবিয়ে দিয়ে নিকট বনে গর্জ্জে উঠল নিদারুণ পশুর হুঙ্কার—সিংহের ডাক। নিমেষের মধ্যে তিনশত্রু দৌড়ে এসে গা ঘেঁসাঘেসি করে একটা দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঐ শোনা যাচ্ছে, বনের শুকনো মরা গাছপালা আর পাতা মড়মড় করে মাড়িয়ে সিংহ আসছে; লতাগুলো ছিঁড়ছে পট্ পট্ পট্। বাণ্টু ওঝা জঙ্গল কাঁপিয়ে হাঁক ছাড়ল—হুঁসিয়ার!

দু থাবা দিয়ে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে লেজ আছড়ে সিংহ এগিয়ে আসতে লাগল। রাগে তার শিউরে যাওয়া কেশরগুলো কাঁটার মত

খাড়া দাঁড়িয়ে গেছে। চোখে ঘোলাটে হিংস্থক দৃষ্টি, মাড়ি বেয়ে মুখের ফেনা আর লালা মাটিতে ঝরে পড়ছে—ঝর ঝর করে। বাণ্টু অভয় আর উৎসাহ দিয়ে আবার হাঁকল—হুঁসিয়ার! হটেনটট্ তার বিরাট বল্লম নিয়ে পাঁয়তারা করে নেচে নেচে সিংহের দিকে এগুতে লাগল। পশুরাজ লাফ দিতেই এক খোঁচায় নামিয়ে দিল তার পেটের নাড়িভুঁড়ি। তার ওপর পড়ল বাণ্টু আর জুলুর বর্শা আর শাবলের মার; রক্তমাখা সিংহ শেষ ডাক ছেড়ে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে রইল।

অন্ধকার নেমে এসেছে গভীর হয়ে; আগুন জ্বালিয়ে সিংহটাকে আধপোড়া করে নিয়ে সবাই পেট ভরে মাংস খেয়ে নিল। হটেনটট্ খুব লম্বা লম্বা ঢেঁকুর ছাড়ছে দেখে জুলু বলল—আমরা না থাকলে কিন্তু হটেনটট্ ভায়া, তোমাকে আজ সিংহের পেটে যেতে হত। আর একটা ঢেঁকুর ছেড়ে হটেনটট্ বলল—হুঁ, তা হয়তো হতো, কিন্তু সিংহ না থাকলে আজ তোমাদের নির্ঘাত আমার পেটে যেতে হতো। দারুণ খিদে পেয়েছিল আজ।

বাণ্টু ওঝা মেজাজ চড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলল—কি বললে? আমায় খাবে হটেনটট্? আমায় মারবে সিংহ আর জুলু? বুঝেচি, আমায় চেন নি। তবে এই দেখ।

এই বলে বাণ্টু তাদের মুখের সামনে তুলে ধরল তার সিদ্ধি কাঠিটা। জুলু আর হটেনটট্ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—এ্যাঁ, তুমি যাদু জান! তবে তুমি একজন ওঝা! খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে তারা বাণ্টুর হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বাণ্টু খুশী হয়ে বলল—রুম্ ব।

আকাশমায়ার উদ্দেশে

বাণ্টু ওঝার দলে আরো অনেক মানুষ এসে ভিড়েছে। আড্ডা এখন সরগরম। জুলু বলল—ওঝা, আর যে ভাল লাগে না। এত জানোয়ারের জ্বালাতন সহ্য করি কি করে? রাতদিন শিকারের দৌড়াদৌড়ি, তারপর যে একটু আরাম করে ঘুমোব তাও হয় না। কাল তো একটু হলে একটা ঢেঁড়াস বোয়াতে পাকিয়ে প্রাণটা মেরেছিল আর কি!

হটেনটট্—ইচ্ছে করে কি জান? জাম্বেসীর পেটুক কুমীরগুলোকে পাথরের ওপর লেজ ধরে আছড়ে আছড়ে সাবাড় করে দি; একটু আরামসে সাঁতার দেবার জো নেই রে বাবা! না, ওঝা এক আধটা মন্তর টন্তর ছাড় এবার। ষণ্ডা হিপোগুলোকে তাড়িয়ে কালাহারীর তেপান্তরে ফেলে দিয়ে এস। শুকিয়ে শুকিয়ে গুগলি হয়ে যাক্ ।।র।

বাণ্টু ওঝা—বাস্তবিক বড় উপদ্রব! সেদিন গেছো বেবুনেরা নতুন তৈরী যুদ্ধু ঢাকটাকে চিবিয়ে একেবারে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। সব বল্লমগুলো তুলে নিয়ে জাম্বেসীর খাতে ফেলে দিয়েছে। এমন করলে আর ...। বাণ্টু ওঝা হঠাৎ চুপ করে দূর আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—ঐ যে দেখছ নীলপাহাড়ের সারি, যার চূড়োগুলোতে রং বেরঙের কুয়াসার পালক কেঁপে কেঁপে রয়েছে, দেখছ? ঐ পাহাড়ের ওপারের দেশটা আমার

মনে হয় নিশ্চয়ই খুব ভাল দেশ। এত দুঃখু সেখানে নেই। এদিকের রোগা রাজহাঁসেরা তরতরিয়ে ওপারে উড়ে চলে যায়, আর ফিরে আসে কেমন নধরটী হয়ে। ওদিকের কালো মেঘগুলো উড়ে উড়ে এসে কী সুন্দর ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে, ঝুরঝুরে বৃষ্টিতে গায়ের জ্বালা সব ধুয়ে যায়।······আর একটা কথা আছে শোন সব; একটু এগিয়ে এস। চুপ করে শোন।

সকলে উৎকর্ণ হয়ে কাছে এগিয়ে এল, মুখে আশঙ্কার ছাপ মাখানো। বাণ্টু ওঝা গলার স্বর খুব চেপে আস্তে আস্তে বলতে লাগল—

—তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে দেখেছ?

—কাকে?

—তাই যদি বলতে পারতাম তবে তো কোন কথাই ছিল না। কে সে তাই জানিনা; কিন্তু সে রয়েছে।

—ওঝা, আমাদের কেমন ভয় ভয় করছে, একটু খুলে বল।

—না, না, তাকে ভয়ের কোন কারণ নেই; সে ক্ষতি করে না। সে ভারী সুন্দর, বড় রঙীন। কত রকম তার গায়ের সাজ। গলার আওয়াজ কী মিঠে; ······ কি না জানি না তবু আকাশে উড়ে বেড়ায়—নেচে নেচে আসে যায় তবু পায়ের শব্দ হয় না। একেবারে বুকের কাছে এসে মুখের ওপর তাকিয়ে থাকে, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই পালিয়ে যায়।

বাণ্টু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করল।

জুলু—তার হাতের অস্ত্র শস্ত্র কি রকম?

বাণ্টু—ওসব তার হাতে কিছু নেই। বরং তার হাতে যত সব অদ্ভুত বাজে জিনিষ, কিন্তু কী সুন্দর মানায়! একদিন দেখি একটা জলপদ্ম হাতে, একদিন একটা নীলপায়রা কোলে। আর একদিন দেখলাম একটা চিত্রা হরিণের বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে চুমো খাচ্ছে।

হটেনটট্—ওঝা, দেখতে পেয়েছি তোমার চোখে জল। তুমি আকাশমায়ার ফাঁদে পড়েছ; আকাশমায়া, আকাশমায়া। আমাদেরও তুমি জড়িয়ে ছাড়বে দেখছি। চুপ করো ওঝা, আমাদের বড় ভয় করছে।

বাণ্টু—আকাশমায়া, তাই বোধ হয়। এই সে দিনও তো সে এসেছিল। টাঙ্গানিকার ধারে সাদা পাথরের চটানে শুয়েছিলাম। রাত্রির অন্ধকারে নীচের বনবাদাড়ে অল্প অল্প ঝড় বইছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ছড়িয়েছিল আকাশে, কুচো কুচো ঝিনুক আর কৌড়ির মত। ঘুমের মধ্যে শুনলাম সে আসছে—টুং টুং টুং। খুব সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। ভাবলাম এইবার বাগে পেয়েছি; সিংহের কেশরে পাকানো মজবুত দড়িটা বাগিয়ে ধরে চট্ করে তাকে বাঁধতে গেলাম। হায়! হায়! সে বাঁধা পড়ল না; তর্‌তর্ করে উড়ে চলে গেল, মিলিয়ে গেল নীল পাহাড়ের ওপারে।

বাণ্টু ওঝা গলা ঝেড়ে নিয়ে এবার একটু সহজ হয়ে নিয়ে বলল—ঐ যাকে বলছ আকাশমায়া তাকে চাই-ই; যেমন করে হোক্। তাই আমার প্রস্তাব তোমরা সব তৈরী হও। নীল পাহাড়ের ওপারের দেশে যেতে হবে, সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে।

দলের আরো অনেকে বলল—হাঁ ওঝা আমাদেরও যেন মনে পড়ছে

হটেন্টট

কোথায় তাকে দেখেছি। এখনো মাঝে মাঝে তার গায়ের সুগন্ধ ভেসে আসে নাকে; হঠাৎ গানের চেয়েও সুন্দর এক একটা শব্দ নদীর ঢেউয়ের মত গড়িয়ে আসে শুনতে পাই।

হটেনটট্ বলল—আমি ও স্পষ্ট একদিন দেখেছিলাম, ঠিক সূর্য্যি ডুববার সময়। একটা চক্‌চকে জন্তুর ছাল গায়ে জড়িয়ে সরসর করে বনের গাছপালা সরিয়ে হ্রদের জলের ভেতর নেমে গেল।

বাণ্টু—তবে আর কথা নেই! কালই যাত্রা সুরু।

টিগ্‌গা মাঝির সর্দ্দারী

ঝাড়খণ্ড জঙ্গলের প্রধান মানুষ টিগ্গা মাঝি। ওঁরাও, টোডা, মুণ্ডা, সাঁওতাল আর হো সকলে তার অনুচর। ময়ূর পাখার চূড়ো পরে টিগ্গা মাঝি দলবল নিয়ে চলেছে আগে আগে, পেছনে হাত বাঁধা একদল লুসাই, নাগা, গারো, কুকি আর মিকির বন্দী হয়ে চলেছে। সিঁদূর মাখানো একটা মস্ত কালো পাথরের কাছে এসে বন্দীদের পাগুলোও বেঁধে দিয়ে একে একে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হল। বন্দীরা ভয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

গেঁড়া গারো বলল—আমাদের মেরো না, ভাল গণ্ডারের মাংস খেতে দেব।

মেড়া মিকির—সাদা হাতীর দাঁত দেব।

ভুংকা লুসাই—সাদা শুয়োরের লোম দেব।

লালু কুকি—বড় বড় কাঠের চঙ্গ করে দেব, আরামে থাকবে।

নেড়া নাগা—শকুনের পালক নেবে? ভালো শকুনের পালক।

টিগ্গা মাঝির দল হো হো করে হেসে উঠল।

টিগ্গা—বলে কি হে, গণ্ডারের মাংস!

টোডা—নিশ্চয়ই ভীষণ তেতো।

কানা ওঁরাও—পুড়িয়ে মারতে চাইছে হে। বোঝ না? বলে কিনা কাঠের চঙ্গ করে দেব।

হাঁদা হো—আবার দাঁত লোম টোম কি তো বলছে। এ নিশ্চয়ই মড়ক লাগাবার মতলব। সাবধান দাদা।

টিপ্পা মাঝি বলল—না, না, যা খুশী বলুক গে। ওদের স্রেফ্ বলি দিয়ে ফেল। হাঁ, তার আগে নিমের ডাল দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ওদের একটু পবিত্র করে নিতে ভুল না।

লুসাইয়ের দল আবার আর্তনাদ করে উঠল। টিপ্পা মাঝি জয়ঢাকে দুম দুম করে দুটো ঘুসি মেরে বলল—এস হে ঝাড়খণ্ডীরা, আগে যুদ্ধ-জয়ের নাচ-বাদ্যিটা হয়ে যাক, তারপর পূজো।

মোষের চামড়ার বড় বড় কাড়া নাগড়া কড়কড়িয়ে বেজে উঠল। পেতলের ঝাঁঝর আর বাঁশের বাঁশি বাজল তার সঙ্গে। উন্মত্ত নাচ আর গানের দাপট দেখে বন্দীদের হৃৎপিণ্ড আর পিলে কুঁচকে যেতে লাগল।

গানে গানে সন্ধ্যে হয়ে গেল। নাচ-গানের নেশা ধরে গেছে তখন, কেউ থামতে চায় না। বন্দী ভুংকা লুসাই বুকে সাহস বেঁধে বলল—ওহে মাঝি, আমরাও কিছু কিছু নাচতে গাইতে পারি; বাজনাতেও আমরা কম নই। টিপ্পা বলল—বেশ, বেশ, চলে এস, ভিড়ে যাও। ওহে টোডা ওদের আর বেঁধে রেখ না, খুলে দাও। ওরাও নাচবে।

নাচ-গান এবার বিচিত্র হয়ে জমে উঠল। সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে; শাল, মহুয়া, পিয়াল, দেওদারে বোঝাই বনের ফাঁক দিয়ে একটু একটু আলো ছিটকে আসছে। ক্রমে আকাশ জাঁকিয়ে ভেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ; মাঠে, জঙ্গলে, নদীতে ও পাহাড়ে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়তে লাগল। নাচিয়েরা মুগ্ধ হয়ে গেল সোনালী চাঁদের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে একসঙ্গে হাঁটু মুড়ে মাটীতে বসে মাথা নুইয়ে রইল। মৃদু ঢাকের বাজনার সঙ্গে সকলে সমস্বরে তিনবার উচ্চারণ করল—চাঁদ নমস্কার, চাঁদ নমস্কার, চাঁদ নমস্কার!

একজন চর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে চীৎকার করে জানাল—সাবধান, সাবধান! শত্রু আসছে। পাহাড়ের ওপারের ভীষণ মানুষেরা দলে দলে আসছে। যেমন হাতিয়ার তেমনি মন্তরের জোর। বেজায় বড় লোক—দামী দামী রোঁয়া হাড়ের মালা, রঙীন পালকের সাজ পরা সব। কোমরে সিংহের লেজ জড়ানো।

খবর শুনে টিগ্গা মাঝি ক্ষেপে উঠল। এক হাতে তীর আর এক হাতে ধনুক তুলে হাঁক ছাড়ল—

খুব সামাল, খুব সামাল, বন্ধুগণ হুঁসিয়ার,
ডরো মৎ ডরো মৎ, সিঙ্গবোঙ্গা সহায় যার।
টাঙ্গি বল্লম শানিয়ে নাও
তীরের ফলায় বিষ লাগাও
চর্ব্বি মাখাও মশালে, মার মার শত্রু মার।

চলল দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত শত্রুর জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষা আর খবরদারী। চর এসে প্রত্যহ খবর জুগিয়ে যায়—এই তারা আসছে নদী ধরে, এইবার পৌঁছেচে হরতকীর জঙ্গলে।

সেদিন সূর্য্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে বানের স্রোতের মত ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল ডুবিয়ে দিল। টেকো পাহাড়, টিকালো পাহাড়—বেঁটে, উঁচু, চ্যাপ্টা, নিরেট সব পাহাড়গুলো যেন গলে গিয়ে অন্ধকারের কাদার মত এক তাল পাকিয়ে পড়ে রইল। সমস্ত জঙ্গলটা গুমরে রইল বিভীষিকার আশঙ্কায়। সোনাচিতা, ডোরাকাটা, কেঁদো আর নেকড়ে যত জাতের সব বাঘ, গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কান্নার মত টেনে টেনে চীৎকার করল। কাক, পায়রা, হরিয়াল ঘুঘু, কাদাখোঁচা আর

বনটিয়া—ঘুম ভেঙে খানিকক্ষণ কিচির মিচির করে আবার চুপ করে গেল। পাহাড়ী চেমনা আর অজগরগুলো পুরানো উইঢিপির ভেতর লুকিয়ে পড়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে শুকনো পাতা আর ধূলো উড়াল। তারপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রইল অসাড় হয়ে। যজ্ঞিডুমুর গাছে অনেকগুলো মৌচাক মধুতে টাবুটুবু হয়েছিল; কয়েকটা পেটুক ভাল্লুক সেগুলো খুঁচিয়ে সব মধু সাবাড় করে খেয়ে গাছতলায় পড়ে রইল—কালো রোঁয়ার গোলগাল ঢ্যাপসা কদমের মত। চাকছাড়া রাগী মৌমাছিরা ঘুমন্ত বাঁদরগুলোকে বিনাদোষে কামড়ে দিয়েছে—তারাই শুধু যন্ত্রণায় কিচমিচ শব্দ করে এগাছ ওগাছ ঝুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে।

আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে হুড়ু পাহাড়ের ঝর্ণার ক্ষীণ শব্দ—দূরে পালিয়ে যাওয়া ঝড়ের দীর্ঘশ্বাসের মতো। জঙ্গলটা কড়া পাথুরে জমি ধরে ধাপে ধাপে নেমে এসে এখানে যেন থেমে গেছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা লাল গিরিমাটীর ডাঙ্গা—সেই বহেড়া, হরতকীর জঙ্গল পর্য্যন্ত। ডাঙ্গার বুক চিরে বয়ে গেছে হাতীভাসান নদী, নুড়ি আর বালির বেশ চওড়া বিছানার মত। নদীর একটা পাশ ঘেঁসে গড়িয়ে যাচ্ছে—ছোট্ট জলস্রোত।

ডাঙ্গার ওপরে একজায়গায় কয়েকটা মশাল ধুক ধুক করে জ্বলছে—প্রায় নিভে এসেছে। চারদিকে চেপে রয়েছে কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া। ভেতরটা অস্পষ্ট দেখা যায়, যেন অনেকগুলো জোয়ান জোয়ান লোক শুয়ে রয়েছে। একজনকে চিনতে পারা যায়—টিয়া মাঝি। এদিক ওদিক পায়চারি করছে আর নিজের মনে বকছে বিড় বিড় করে। এমনি করে ভোর হয়ে এল

টিগ্‌গা মাঝি জয়ঢাকে দুম্‌ দুম করে দুটো ঘুসি মেরে

বলে,—এসহে ঝাড়গণ্ডীরা·········

আবছায়ার মত কে একজন নদীর বালিয়াড়ি থেকে উঠে এসে টিগ্গা মাঝির কাণে কাণে কি বলল। এই হল এদের যুদ্ধ সর্দার টোডা পিরথম্ ধান্। টিগ্গা ব্যস্ত হয়ে সকলকে জাগিয়ে তুলল ; হুকুম হল—তাক্ বুঝে যে যার জায়গা নাও। এক একটী ঝোপে দুজন করে পড়। আমি আর টোডা রইলাম এগিয়ে। চুপ ! ঐ তারা আসছে।

ভোরের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল হরতকী বনের ভেতর থেকে একে একে অনেকগুলি মানুষ বেরিয়ে আসচে। কোন রকম হল্লা চীৎকার নেই ; শুধু আস্তে আস্তে নাগাড়ার আওয়াজ। কিছুদূর এগিয়ে এলে পর চেনা যায়—তারা কে ?

বাণ্টু ওঝা—তাইতো, এরকম ভাবে কতদিন আর চলব। আবার সামনে জঙ্গল, কোথায় শেষ হয়েছে জানি না। এ ডাঙ্গাটায় কটা দিন বসে আরাম করলে বেশ হতো। মাটীটা কী সুন্দর দেখছ ? কেমন লালচে ? বুনো মোষের বাসি রক্তের মত একটু মেটে মেটে।

এক ঝাঁক তীর এসে বাণ্টুর দলের ওপর হঠাৎ শিলাবৃষ্টির মত ঝরে পড়ল। বাণ্টু চমকে ডাকল—রুম্ ব, রুম্ ব। আবার এক ঝাঁক তীর। একজন জুলু কাটাগাছের মত মাটীতে লুটিয়ে পড়ল ; একটা তীর তার বুকে বিঁধেছে। বড় করুণভাবে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—ওঝা, ওঝা, তবে আমি চললাম। বিদায় ! আমার বল্লমটা দেশে নিয়ে যেও ; ছেলেটা এতদিনে বড় হয়ে গেছে, এ সম্পত্তি তার। আমার মাথার চুলগুলোও ছিঁড়ে নিয়ে যেতে ভুলো না ওঝা, তারা পেলে কত খুশী হবে। আর পারতো আমার দাঁতগুলো চোয়াল থেকে

খুলে নিয়ে——······ জুলু আর বলতে পারল না। সব শেষ হয়ে গেল।

বাণ্টু ওঝা হতভম্ব হয়ে গেল। এ কি ? জুলু মরে গেল ! কে মারলে ? শত্রু ? রুম্‌ব !

বাণ্টুর দলের রক্ত এবার ক্ষেপেছে। বড় বড় বল্লমগুলো সাপের হিংস্র ফণার মত দুলতে লাগল। দামামার তালে তালে নাচ আর হুঙ্কার। এই রণনির্ঘোষের উত্তর পাওয়া গেল নদীর ওপার থেকে। এক একটী ঝোপ থেকে গাঁট্টা সাট্টা চেহারা জোড়া জোড়া যোদ্ধা বেরিয়ে এল ভীম উল্লাসে। তাদেরও নাগাড়া বেজে উঠল——দনন্ দনন্। দুদিন দুরাত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ——আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলল। কতক মরল কতক হল আহত।

দুপক্ষই বড় ক্লান্ত। যোদ্ধারা একটু জিরিয়ে নিতে গেলেই ঘুমে ঢুলে পড়ে। এমনি অবস্থায় একদিন সন্ধ্যেয় সত্যি সত্যি কাটাকাটির হুল্লোড় আপনা থেকে ঝিমিয়ে এল। দেখা গেল——নদীর দুপারে দুটী যোদ্ধার আড্ডা নিস্তব্ধ ; যোদ্ধারা ঘুমে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। শুধু দুটো মশাল দু'দলের প্রহরীর মতো নদীর দুপারে মিটমিট করে জ্বলে রয়েছে।

মাঝরাত্রে পশ্চিম আকাশটা হঠাৎ রক্তজবার মত লালে লাল হয়ে গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে চলেছে পশ্চিম থেকে পূবে। ব্যাপার কি ? পশ্চিমে সূর্য্যোদয় হল নাকি ? শালিক, সারস, বক, কাক, শকুন আর ময়ূর থেকে শুরু করে কাকাতুয়ার মত বাবু বাবু পাখীগুলো সব পালিয়ে যাচ্ছে কোথায় ? বাণ্টু ওঝাই এ ব্যাপার প্রথম দেখতে

পেয়ে সকলকে ঠেলে ঠেলে ঘুম ভাঙাল। নদীর ওপার থেকে তখন আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার শোনা গেল—পালাও ; পালাও। জংলী আগুন ! আলোদানা ! কারু রক্ষা নেই, পালাও।

নদীর বালিয়াড়ি ধরে তখন হাজার হাজার জানোয়ার ছুটে পালাচ্ছে—নীলগাই, বনশুয়োর, খরগোস, ভালুক, বাঘ আর শেয়ালের পাল। কারু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ; ঊর্দ্ধশ্বাসে মরিবাঁচি করে দৌড়ে সব পূবের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাণ্টু ওঝা বলল—ভাই সব, বিপদ সামনে, তায় বিদেশ। পথ জানা নেই। চল শত্রুরই শরণ নিই ; ওরা বাঁচবার পথ জানে। হটেনটট্ চেঁচিয়ে বলল—ঐ যে ওঝা, দেখতো, ওরাই ডাকছে বোধ হয়। হাঁ, তাইতো। —পালাও, পালাও, পালাও।

টিগ্রামাঝি আর বাণ্টু ওঝার দল মিলে একটা দল হয়ে দৌড়তে লাগল সোজা উত্তরে। পথে সাতদিন চলে, সাতরাত ঘুমিয়ে তারা পৌঁছল বুণ্ডুপাহাড়। তারপর বিরাট একটা কাঁকরে মাঠ—সীমাহীন মনে হয়। সেই মাঠ ধরে ছুটে ছুটে তারা পৌঁছল ভুরকুণ্ডা—বেলে-মাটীর দেশ। তারপর বুড়াডিহির করমচা জঙ্গল ; সেটা পেরিয়ে কুজ্জু-ঘাট—বেঁটে বেঁটে বাবলার চারায় ছেয়ে রয়েছে। খানিকটা চড়াই আর উতরাই। তারপর শেষে একেবারে তোপচাঁচির বিল। এইবার মনের মত জায়গা পাওয়া গেল—বিল, নদী, মাঠ, বন ও পাহাড় সব একসঙ্গে সাজানো। দলবল এসে তোপচাঁচির ধারে মেঘগড়া পাহাড়ের ঢালুতে এসে বসতি করল।

মেঘগড়া পাহাড়ের গা ছাওয়া জঙ্গল চুঁড়ে সকলে একদিন রাশি রাশি ফল জড়ো করল—কেঁদ, কুল, পিয়াল, জাম ও ডুমুর। হটেনটট্

গোটা দশেক বনছাগল মেরে কাঁধে চাপিয়ে এসে হাজির; ভুংকা লুসাই গলায় একটা তিতির আর কাঠবিড়ালীর মালা ঝুলিয়ে পৌঁছল। সেদিন বড় উৎসব। ফল মাংস আর তোপচাঁচির জল খেয়ে বাণ্টু ওঝার মুখে হাসি ফুটলো।

বনদেবীর কথা

টিগ্না মাঝি ঠাট্টা করে বলল—কি গো বীর! কেমন লাগল এদেশের খাবার আর জল? উঃ কত বড় চোয়াল হে তোমাদের! হাঁ করলে কানদুটো পর্য্যন্ত এঁটো হয়ে যায়! কি হয়েছিল তোমাদের যে দেশ ছেড়ে সেখান থেকে তেড়ে আমাদের খেতে এলে?

বাণ্টু—মিছে বদনাম কর কেন? কে বললে তোমাদের খেতে এসেছি? আমরা খেতেও আসিনি, লড়তেও আসিনি।

—তবে কি জন্য?

—এসেছি একজনকে খুঁজতে।

—একজনকে? তা হলে এতদিনে সে চিতেবাঘের পেটে।

—না হে না। সে সেরকম জন নয়। তাকে দেখলে, কাছে পেলেও ধরতে পারা যায় না।

—বনদেবীর কথা বলছ না কি?

—কি বল্লে? বনদেবী? বল তো ভাই শুনি সে আবার কি রকম।—বাণ্টু ওঝা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল।

—আমরা প্রায়ই তাকে দেখতে পাই। শিকার থেকে ফিরতে পথে সন্ধ্যে নেমে আসে; আকাশে চাঁদের থলে থেকে আলোর ঝুরি ঝরে পড়ে গাছের চূড়ো চিকচিকিয়ে দেয়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে কিছু আলো গলিয়ে জঙ্গলের মাটীতে লুটিয়ে পড়ে। বনের পথে একা হনহনিয়ে আসি, সঙ্গের সঙ্গী শুধু নিজের ছায়া। তীর ধনুক থাকলেও ভয়ে গাটা

ছম ছম করে। এ রকম চলতে চলতে পথ আর শেষ হয় না। তখন বুঝতে পারি পথ ভুল হয়েছে —একই জায়গায় পাক দিয়ে ঘুরে ফিরে আসছি। কত পাপী এমনি করে পাহাড়ী পিশাচের ফাঁদে পড়ে সমস্ত রাত পাগলের মত ছুটোছুটি করে মুখে রক্ত উঠে মরে পড়ে থাকে। সকালে দেখা যায় লাসটা পড়ে আছে ঠিক আসল পথের ওপরে। এই রকম পাহাড়ী পিশাচের ঘোরে যখন পড়ি তখন চোখ বুজে একমনে ডাকি বনদেবীকে। একটু পরে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাই —বনদেবী দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা ফুলের গয়নায় গা ভরা, লম্বা লম্বা কালো চুল, দুপাশে ছোট দুটো পাখনা। বাস্ আর ভয় থাকে না ; বনদেবীর পেছু পেছু চলতে থাকি। এমনি করে এগিয়ে দিয়ে ঠিক মাঠের কাছাকাছি এসে বনদেবী হওয়ায় মিলিয়ে যায়।

বাণ্টু আনন্দের চোটে টিয়াকে জড়িয়ে ধরে বলল—ঐ, ঐতো আমার আকাশমায়া। তবে তাকে পাবো, নিশ্চয়ই পাবো।

আবার শত্রু

পাহাড়ের চটানে বসে খোসগল্প চলছে। দক্ষিণদিক থেকে ঝির-ঝিরে বাতাস বয়ে আসছে। খুশী হয়ে বাণ্টু বলল—এই দিকের জঙ্গলটা কতদূর এগিয়ে গেছে বলতে পার ? এর শেষটায় কেউ কখনো গিয়েছ ?

গেঁড়া গারো—নিশ্চয়ই। এদেশে আসবার আগে আমরা তো কিছুদিন ওদিকেই ছিলাম। জমি বেশী দূর নেই ; তারপর শুধু জল আর জল। মুখে দেওয়া যায় না এত লোণা। সেই নীল লোণা জলটা কিছু দূর গিয়ে উঁচু হয়ে আর আকাশটা কিছু নীচু হয়ে দুটোয় একেবারে মিলে গেছে।

বাণ্টু—সমুদ্র ! তাই বলো। কি হে টট্, কঙ্গোর মোহানায় বেড়াতে গিয়ে দেখ নি ? সেই যেখানটায় পৃথিবী আর সমুদ্রের আরম্ভ ?

হটেনটট্ বলল—কতবার তো দেখেছি।

গেঁড়া গারো—ঐ দক্ষিণ সমুদ্রের সবটাই জল নয়। সারি সারি টুকরো টুকরো জমি পানকৌড়ির মত ভেসে আছে।

বাণ্টু—হাঁ, হাঁ, যাকে বলে দ্বীপ।

গারো—কতদূর যে গেছে বলা যায় না। সে জমিতে পাখী আছে, জানোয়ার আছে। মানুষ নেই তবে মানুষ সেখানে মাঝে মাঝে আসে। আমরা সাঁতার দিয়ে একদিন একটা দ্বীপে উঠেছিলাম ; দেখলাম বড় বড় গাছ কাটা—স্পষ্ট কুড়ুলের ঘা। পোড়ান হাড়ের ছাই ও দেখেছি, আর মানুষের খুলি দুচারটে।

বাণ্টু—আমি বেশ বুঝছি ঐ দিক থেকেই একদিন একটা আপদ এসে আমাদের অতিষ্ঠ করবে। ওদিকে একটা খাড়া পাহাড়ও দেখেছি না যে শত্রুর পথ আগলাবে। তারপর কুড়ুলধারী মানুষ তারা ; নরম নরম চন্দন নারকেল আর তালের বন সাবাড় করে, বনতুলসীর ঝাড় পুড়িয়ে দিয়ে তাদের এখানে পৌঁছে যেতে কতক্ষণ ?

টোডা—যদি এসেই পড়ে কি আসে যায় তাতে ওঝা ! গুনে গুনে তাদের খুলি নামিয়ে মালা তৈরী করব।

গারো—হুঁঃ, কত দাঁতাল হাতী ঠাণ্ডা বানিয়ে দিলাম, এতো মানুষ। বেশী বাড়াবাড়ি করে তো খেদা করে গর্ত্তে ফেলে মারব।

টুডু সাঁওতাল—আসুক না একবার ! যতক্ষণ বনের আড়ালে ততক্ষণ মাঠের ওপর পা বাড়িয়েছে কি এক এক তাকে কলজে ফুঁড়ে ফুঁড়ে লাস শুইয়ে দেব পটা পট্।

বাণ্টু—আরে যদি মিতালী করতে চায় তবে প্রাণ নিয়ে লাভ কি ? এখানে তো খাবার অভাব নেই ; দলে ভিড়িয়ে নিলে বরং আড্ডা বেশ জেঁকে উঠবে। তবুও বলছি ওদিকে একটু নজর রেখ !

* * * *

কদিন বড় জলের কষ্ট চলেছে ; তবুও এটা শীতের সময়। তোপ-চাঁচির বিলে জলের নাগাল পাওয়া যায় না, কেবল পাঁক থই থই করছে চারদিকে। শুধু মাঝখানে একটুখানি জল। কেয়াবনের যত বিষধর সাপগুলো—কালকেউটে, চিতি আর খয়াগোখরো—বিলের পাঁকে সব সময় বেঙাচি মেরে বেড়াচ্ছে। সেদিকে জলের আশা নেই।

একদিন বাণ্টু ওঝা গোটাকয়েক অনুচর নিয়ে ভেড়া নদীর শুকনো

বালিয়াড়ির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, জলের সন্ধানে। স্রোতের চিহ্নটুকু আছে, জলের চিহ্ন নেই। সব শুকনো; ভেজানুড়ির গায়ের শেওলা-টুকুও শুকিয়ে ঝরে গেছে। শামুক গুগলি মরে গিয়ে বালি আর কাঁকরের সঙ্গে মিলেমিশে পড়ে আছে।

টিগ্না মাঝি বুদ্ধি দিয়ে বলল—বালি উপড়ে ফেল; নিশ্চয় নীচে জল লুকিয়ে আছে। বালি খুঁড়ে জলের দেখা পাওয়া গেল। খুব ফূর্তি করে সকলে আরো দুচারটা গর্ত্ত খুঁড়তে লাগল।

বাণ্টু ওঝা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—ওহে, এ কি রকম হল? বেলে হাঁসের দল দক্ষিণের জঙ্গল ছেড়ে উত্তরে উড়ে পালাচ্ছে, এ কি ব্যাপার? উত্তরের পাহাড়ে কী ভীষণ হিমেল কুয়াসা ঠেসে রয়েছে দেখছ? তবুও হাঁসগুলো ঐ দিকেই যাচ্ছে।

সকলে বলল—হাঁ, এ অদ্ভুত বটে।

টিগ্না—টোডা, নাগা, মিকির আর হো; হাতিয়ার গুছিয়ে সেজেগুজে তোমরা বেরিয়ে পড়। বনতুলসীর ঝোপে ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে যাবে। দক্ষিণের জঙ্গলে মানুষ এসেছে, আমি বলছি। তারাই হাঁস তাড়াচ্ছে।

বাণ্টু—টট্ তুমিও সঙ্গে যাও। পাকা সন্ধান নিয়ে ফিরবে। আর দেখ মিছামিছি ঘায়েল করে বসো না। হুম্ ব।

হটেনটট্ বলল—যে আজ্ঞে।

ইঙ্কার চন্দন কেল্লা

বড় বড় থামের মত চন্দন গাছের গুঁড়ি মাটিতে পুতে গোলাকার ঘেরান করা। তার একটা মাত্র ফটক, ভেতর থেকে মস্ত একটা তালগাছের খিল দিয়ে কপাট ভেজান রয়েছে। ফটকের ওপর ঝুলছে একটা ঘণ্টা। সেই বেড়া ঘেরা জমির ওপর আবার ছোট ছোট তাল-পাতার ছাউনী আর খেজুর গাছের খুঁটী। খুঁটীতে ঝুলছে অস্ত্রশস্ত্র। চামড়ার ঢাল, শিঙে, বর্শা, কুড়ুল, তীরের গোছা আর খাঁড়া। মাঝখানে একটা কাঠের মঞ্চ, তার ওপরে কুচকুচে কালো পাথরের বেদী; বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সাপের মূর্ত্তি—ঝক্‌ঝকে চাঁপা রঙের ধাতুতে তৈরী। নিশ্চয়ই সোনা।

কাঠের মঞ্চের নীচে পালকের পোষাক পরা একজন হেলান দিয়ে বসে আছে; হাতের কাছে লম্বা এক বল্লম—সোনার আংটা আর ঘুঙুর পরানো। চার পাঁচটা কচ্ছপের খোলায় লাল নীল হলদে বেগুনী নানা রকম রং গুলে রাখা হয়েছে। কচি বাঁশের কঞ্চি থেঁৎলে গোটাকয়েক তুলিও তৈরী করা রয়েছে।

—ওহে মেটে মাওরী। লোকটা ডাকল; গলার স্বর বড় মোটা আর কঠোর।

—আজ্ঞে বড় ইঙ্কা! তালপাতার ছাউনী থেকে একজন বেরিয়ে এল।

—আমার গাটা ভাল করে রঙাতে হবে। এই তুলি দিয়ে এক এক করে বেশ টেনে টেনে রং লাগাও। বুকের ওপরটায় রামধনুর

।মার গাটা ভাল করে রঙাতে হবে

মত সোজা সারি সারি রঙের টান দেবে। পা দুটো হলদে করো আর আঙুলগুলো রেখ সবুজ। বুঝলে?

—ওহে বেঁটে তাসমানি। বড় ইঙ্কা আবার ডাকল।

—আজ্ঞে।

—যাঁতা বসানো হয়ে গেছে কি? এবার ভুট্টার দানাগুলো যা আছে সব পিষে ফেল। পেটভরে চাপাটী খেতে হবে আজ। ওঃ সেই কবে দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি! দিন আর রাত গাছের গুঁড়ি বুকে সাপটে সাঁতার আর সাঁতার! গায়ে আঁস গজিয়ে গেছে। —আর একটা কথা; সন্ধ্যে হয়ে গেল ওরা এখনো ফিরল না কেন? কি ছাই ক্ষুদে ক্ষুদে হাঁস মারতে গেছে। ঘণ্টা দাও, ঘণ্টা দাও। ফিরে আসুক সব।

ইঙ্কাদের চন্দন কেল্লার ফটকের ওপর বিরাট মশাল জ্বলে উঠল।

ঘণ্টা বাজতে লাগল—ঢং ঢং ঢং। একটু পরেই হল্লা করতে করতে সকলে ফিরে এল, সঙ্গে কয়েকজন নতুন অতিথি—টোডা, নাগা, মিকির, হো আর হটেনটট্।

বড় ইঙ্কা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—এ্যাঁ, এরা আবার কে? এ কাদের চরিয়ে আনলে হে কটা কিউবানি!

কটা কিউবানি—বড় লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেছে বড় ইঙ্কা। এইটুকু একটা বেঁটে জানোয়ার—থাবা নেই, শিং নেই কিন্তু কী সাংঘাতিক আওয়াজ—ঐ দেখুন সঙ্গে নিয়ে এসেছি। মনের সুখে হাঁস মারছি এমন সময় হঠাৎ সামনে এসে ডাক ছাড়ল—হেঁকো—কে-

কে—হেঁকো! আমরা ভয়ে আধমরা হয়ে গেলাম। এরা ছিল আড়ালে লুকিয়ে আমাদের খুন করবার জন্য; থাকতে না পেরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল—জন্তুটার কাণ ধরে টেনে নিয়ে এসে আমাদের ভয় ভেঙে দিল। এর নাম বুনোগাধা। ······মারামারি না করে এমনিভাবে যখন এদের সঙ্গে মিতেলি হয়েই গেল তখন নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলাম।

বড় ইঙ্কা মুখ বেঁকিয়ে গাধাটার পেটে কেঁৎ কেঁৎ করে দুটো লাথি মেরে তার ডাক শুনে নিল। বলল—বাস্তবিক! বড় বিশ্রী আওয়াজ করে হে!

বেঁটে তাসমানি তার ধারালো বুমেরাংখানা দুতিনবার শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি করে জোর গলায় বলল—আমি, আমি থাকলে কিন্তু বড় ইঙ্কা, এ সব লজ্জার ব্যাপার হতে দিতাম না।

হটেনটট্ ঘড় ঘড় করে গলার আওয়াজ করল। বড় ইঙ্কা বলল—যাক সে সব কথা। ভোজনের ব্যবস্থা কর।

সকলকে চাপাটী পরিবেষণ করা হল। বড় ইঙ্কা খুশী হয়ে সকলের সঙ্গে অনেকক্ষণ গুলগুজব করে, শেষে বলল—আমরা ও তাই চাই। লড়াইয়ের বদলে আগে থেকেই মিতালী করে নেওয়া ভাল। তা হ'লে কথা রইল, কাল ভোরে সবাই একসঙ্গে রওনা হওয়া যাবে। দেখি তোপচাঁচি কেমন জায়গা; ভাল বুঝলে সেখানেই ডেরা করব।

বড় ইঙ্কা আবার হুকুম করল—ওহে মাওরী আর তাসমানি। তোমরা একটু নজর রাখবে। আজ রাত্তিরের মতো নতুন ব্রাদারদের যেন কোন কষ্ট না হয়।

জলপরীর কথা

ইঙ্কা তার দলবল নিয়ে এসে যোগ দিয়েছে। তোপচাঁচির আড্ডা এবার গুলজার। শিকার খেলা গল্প নাচ গান আর বাজনা পূরো দমে চলছে। সকলেই বেশ খুশী, শুধু বাণ্টু ওঝা মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায়।

একদিন রাত্রে হঠাৎ একটা হৈ চৈ। সবাই তখন ঘুমোচ্ছে, বেঁটে তাসমানি বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগল—আমার ঘাড় চাটলে কে? উঃ, বড় ইঙ্কা শীগ্‌গির ওঠ।

সকলে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। মশাল জ্বালার পর দেখা গেল হ্যেনটট্ তখনো শুয়ে ঘুমের ঘোরে জিভ বার করে কি চাটবার চেষ্টা করছে। তাসমানি সভয়ে বলল—দেখলে তো বড় ইঙ্কা। সকলে মিলে একটা ঝাঁকানি দিতে টট্ ধড়ফড় করে উঠে চেঁচিয়ে উঠল—বল্লম! বল্লম! বাণ্টু ওঝা ধমক দিয়ে বলল—বল্লম ফল্লম নয়, শোন। তুমি তাসমানির ঘাড় চেটেছ কেন?

টট্—কই, না তো!

তাসমানি—আবার মিথ্যে কথা! এখনো ঘাড়টা জ্বলছে। উঃ কী খসখসে জিভরে বাবা!

টট্—বেশী ডেঁপোমি করো না বেঁটে।

তাসমানি ভয়ানক রেগে গেল। বুমেরাংটা বাগিয়ে নিয়ে মারমূর্তি হয়ে বলল—চালাকি পেয়েছ? কিছু বুঝি না? কাঁচা মানুষ খাবার

সখ রয়েছে পেটে পেটে—আজ মেরে আমি তোমার চোদ্দপুরুষের অভ্যাস ছাড়িয়ে দেব।

টটের গলা দিয়ে আবার ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুল। বললে—বড় ইঙ্কা—কাঙারুর ভাইটাকে মুখ সামলাতে বল, নইলে··· ।

'তবে রে' বলে তাসমানি তেড়ে আসতে সকলে মিলে তাদের ঠাণ্ডা করে বসিয়ে দিল।

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কারু ফিরে ঘুম আসছিল না। বাণ্টু ওঝা জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁ হে বড় ইঙ্কা, তোমরা কি এদেশে শুধু বেড়াতেই এসেছ ?

বড় ইঙ্কা—হাঁ, তা ছাড়া আর কি ! আর তোমরা ?

—আমরা এসেছি একজনকে খুঁজতে। তাকে হাতের কাছে পাচ্ছিও কিন্তু ধরতে পারছি না।

—সে আবার কি ?

—তার নাম আকাশমায়া। ভারী সুন্দর সে দেখতে, দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। মাঝিরাও তাকে দেখেছে।

—আমরাও ঐ রকম একটা দেখেছি ওঝা। তবে বলি শোন।

একদিন দেশে এক হরিণের পালকে তাড়া করতে তারা দৌড়ে প্রেরির তেপান্তরে নেমে পড়ল। আমরাও ছাড়বার পাত্র নই; সঙ্গে সঙ্গে নামলাম। কিন্তু কোথায় যে হরিণগুলো উধাও হল কোন হদিস পেলাম না। এদিকে দুপুরের রোদে প্রেরির মাঠ তেতে তাতারসি খেলতে লাগল। পথভুলে এদিক ওদিক দৌড়ে শেষে ক্ষিধেয় তেষ্টায় আধমরা হয়ে বসে পড়লাম। সন্ধ্যে হতেই দেখি, অন্ধকারে একটু

দূরে কে যেন বসে রয়েছে ; নীল লাল ধোঁয়ার মত লতায় তৈরী তার শরীরের ওপরটা ; কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত জলের ঢেউ দিয়ে জড়ানো। মনে হল যেন হেলে দুলে ভাসছে। একটা ঝরনার জলের কলকল শব্দের মত আওয়াজ কানে এল। এগিয়ে গিয়ে দেখি মাঠ ফুঁড়ে কী সুন্দর ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে যাচ্ছে—আশে পাশে ভেজা মাটীর ওপর ফলে রয়েছে বড় বড় শসা। আরো দেখলাম একটা রামকাছিমের খোলা পড়ে রয়েছে সুডোল একচালার মত। খাওয়া দাওয়া সেরে খোলার ভেতর ঢুকে সবাই মিলে দিলাম লম্বা ঘুম। এ রকম আশ্রয় না পেলে সেদিন হয়তো আমাদের কণ্ডরে ঠুকরে মেরে ফেলত।

টোডা—সে জায়গাটায় একটা পূজো টুজো দিয়েছিলে তো ?

ইঙ্কা—আরে সত্যিই কি ওরকম কোন জায়গা আছে নাকি ? এ সব জলপরীর মায়া। যারা লোক ভাল, সাপকে খুব ভক্তি করে, তাদের জলপরী এমনি করে বিপদে আপদে রক্ষা করে।

বাণ্টু ওঝা—তা হলে বোঝ এবার। এ শুধু আমার ভুল নয়, সকলেই দেখেছে তাকে। একটা কিছু রয়েছে ভাই, রয়েছে রয়েছে। তাকে শুধু ধরতে পারছি না তাই।

সকলে—তাই বটে।

আকাশমায়ার ডাক

সেদিন ছিল নতুন মেঘ পরব। বর্ষা যে আসছে তার নিশানা দিয়ে একটা কালো মেঘের টুকরো গ্রীষ্মের রোদে ঝলসানো আকাশের ওপর পাড়ি দিয়ে গেল। নেতিয়ে পড়া শরীরগুলো ফূর্ত্তির সঙ্গে পরবে মেতে উঠল। নাচ গানও চলেছিল বেশ একটু রাত পর্য্যন্ত। ক্লান্তি বেশী হওয়াতে ঘুম ও এলো খুব জমাট হয়ে।

নিশুথ রাত্রে সবাই যখন ঘুমে একেবারে অসাড়, হটেনটট্ আবার এক কাণ্ড করে সবার ঘুম নষ্ট করে দিল। সে অশথপাতার বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে লম্ফঝম্প চেঁচামিচি করে হুলস্থূল বাধিয়ে দিল। আচম্‌কা ঘুম ভেঙে সবাই অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াল। মশাল জ্বাল! মশাল জ্বাল! মশালের আলোয় দেখা গেল হটেনটট্ চুপ করে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে নাক ঘসছে। বলল—নাকের ভেতর একটা ফড়িং মরে রয়েছে, বার হচ্ছে না।

ভুংকা লুসাই রোগা মানুষ, একটুতে চটাং করে রেগে যায়। ঝাঁঝিয়ে উঠে সে বলল—আশ্চর্য্য বেয়াড়া নাক রে মশাই! কাল থেকে তুমি বাইরে ঘুমিও।

টট্ বলল—নাকের মর্ম্ম তুমি কি বুঝবি খেঁত্থ লুসাই। ঘুমোও ঘুমোও।

এদের রাগারাগিতে একটা হাসির সোর পড়ে গেল। মেটে মাওরী ডাকল—ও বাণ্টু, ওঝা শুনছ তো। কোন উত্তর না পেয়ে মাওরী

তাকিয়ে দেখে বান্টুর বিছানা খালি পড়ে আছে—বান্টু নেই। সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ল। বান্টু যদি বাইরেই যেতো তো নিশ্চয়ই কাউকে জানিয়ে যেত। এমন না বলে উধাও হবার মানে কি? অনেক হাঁকডাকের পরও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন অগত্যা স্থির হলো—খোঁজে বেরুতে হবে।

বাকী রাতটুকু বান্টু ওঝার খোঁজে খোঁজে শেষ হয়ে গেল। ভোর হলে দেখা গেল অজ্ঞান অসাড় বান্টু গুহাটার কাছাকাছি আমলকী গাছের নীচে পড়ে আছে। সকলে জলের ছিটে আর মন্তরের ফুঁ দিয়ে বান্টু ওঝাকে সুস্থ করল। বান্টু আঁজলা ভরে জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

—কি ওঝা? কি ব্যাপার?

—সে আমায় ডেকে নিয়ে এসে পালিয়ে গেল। রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখলাম সে ঘুরে বেড়াচ্ছে; পেছু পেছু চললাম—সেও চলল। দৌড়লাম, সেও দৌড়ল। এই গুহার কাছে এসে সে দাঁড়াল; ডাকলাম—তুমি যেও না, এস এস। সে বলল—আমি যাব না, তুমি এস। এই গুহার অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল।

বান্টুর অবস্থা দেখে সবারই বড় কষ্ট হচ্ছিল। তারা বলল—এবার ঘরে চল ওঝা।

—কিন্তু আমার আকাশমায়া যে বলেছে—আমি যাব না, তুমি এস।

—এখন তো ঘরে চল।

ফসল পূজা

বড় ইঙ্কা দাঁড়িয়ে দেখছিল। ঘাসের মতন এক রকম গাছের শীষ থেকে পাকা পাকা দানাগুলো মাটীতে ঝড়ে পড়ছে; এক ঝাঁক ঘুঘু ঠুকরে ঠুকরে খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলো মুখে পুরছে। ইঙ্কার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ঘুঘুগুলোকে হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে একছড়া শীষ হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর একটা দানা খুঁটে খোসা ছাড়িয়ে চিবিয়ে দেখল। শেষে খুব উৎফুল্ল হয়ে শিঙেতে ফুঁ দিতে লাগল।

দৌড়, দৌড়, দৌড়। শিঙের আওয়াজ শুনে যে যেখানে ছিল, নাচ, গল্প, শিকার ছেড়ে দৌড়ে এল মাঠের ওপর।

—কি ব্যাপার বড় ইঙ্কা! কোন বিপদ?

—পেয়েছি, পেয়েছি। বড় ইঙ্কার চোখ দুটো খুশীর চোটে গোলাপী লিচুর মত টুসটুসে হয়ে উঠল। বান্টু ওঝা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—এ্যাঁ, পেয়েছ, তাকে পেয়েছ?

—না, না, তাকে নয়। এ অন্য জিনিষ।

—কিন্তু কালই তো সন্ধ্যেয় দেখেছি, এই মাঠে সে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত গায়ে জোনাকীর গয়না পরা। ভোরে এসেও আমি শিশির ভেজা ঘাসে তার পায়ের দাগ দেখে গেছি।

ইঙ্কা বুঝিয়ে বলল—তার কথা হচ্ছে না ওঝা। আমাদের দেশের ভুট্টার কথা তোমাদের বলেছি না; এই যে সব দানা দেখছ এও সেই ভুট্টার মত কাজ দেবে। চাপাটী হবে, ভাত হবে, খই হবে।

ইঙ্কার হুকুম মত সবাই দানাভরা শীষের বোঝা ঘাড়ে করে আড্ডায় নিয়ে এসে জড়ো করল। বেঁটে তাসমানি বলল—বড় ইঙ্কা, সব খই করে ফেলা যাক।

মেটে মাওরী—না, না, ভাত হোক।

কটা কিউবানি—বেশ হয় যদি গুঁড়িয়ে নিয়ে চাপাটী করা হয়।

গেঁড়া গারো চন্দন কেল্লায় প্রথম চাপাটী খাওয়ার আনন্দ ভুলতে পারেনি। সে জিভে জল সামলাতে সামলাতে সায় দিয়ে বলল—হাঁ হাঁ ঐ সাপাটি, সাপাটি।

বড় ইঙ্কা—থামাও সব বাজে কথা। ও সব এখন কিছু হবে না। এর চাষ করতে হবে। বিলের পূব দিকের নরম জমিটাতে দানাগুলো সব পুতে ফেলতে হবে। তারপর দেখবে কিছুদিন পরে—ইয়া ইয়া গাছের ঝাড় আর থোপা থোপা শীষ; দানায় দানাময়। তখন কত খাবে খাও না। আর চাষের সঙ্গে······। বড় ইঙ্কা একটু চিন্তিত হয়ে চুপ করে গেল।

—চাষের সঙ্গে ?······সকলে প্রশ্ন করল।

—না থাক পরে হবে।

—বলেই ফেল না বড় ইঙ্কা। মিছে কেন আমাদেরও একটা চিন্তেয় ফেলে রাখবে।

বড় ইঙ্কার স্বর বড় গম্ভীর। বলল—শোন, চাষের সঙ্গে বলিদান চাই। পবিত্র জোয়ান নীরোগ মানুষ বলি। দেবতার দয়া না হলে তো ফসল ফলবে না।

ইঙ্কার কথায় সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বড় কঠিন প্রশ্ন। একজনের প্রাণ আর একশ জনের সুখ। আজ এখানে যারা মাটির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, কাল সেই বনের পশুপাখী সব হয় তো দূর জঙ্গলে চলে যাবে। বনে কুল, কেঁদ, ডুমুর হয়তো আর ফলবে না। তখন মানুষের হবে কি ? কি খেয়ে মানুষ বাঁচবে ? না খেতে পেলে এমন সুন্দর মানুষ শেষ হয়ে যাবে। তোপচাঁচির আড্ডায় নাচতে গাইতে আর কেউ থাকবে না।

এই সব কথা চুপ করে ভাবছিল একজন। টোডা পিরথম্ ধান্। ধীরে ধীরে সে দাঁড়িয়ে উঠল, এক হাত বুকে রেখে আর এক হাত আকাশের দিকে তুলে বলল—আকাশের মালিক হে নীল ডোডাবেট্টা, তোমায় গড় করি; আর গড় করি তোমাদের তিন ওস্তাদ—টিগ্না, বাণ্টু আর ইঙ্কা।

টোডার চোখে মুখে যেন শেষ রাত্রির তারার আভা ফুটে উঠল। সে বলে চলল—

—ফসল দেবতার তুষ্টির জন্য বলি দিতে হবে, নইলে ফসল ফলবে না। এই জন্যে তোমরা ভাবছ ? আমার অনুরোধ, তোমরা খুশী হয়ে আমায় বলি দাও, আমি তৈরী।

এর প্রতিবাদ করে হুটেনটট্ কি যেন একটা বলবার জন্য উঠে দাঁড়াল। না বলতে পেরে ধপ করে বসে পড়ল।

সুসংবাদ ! সুসংবাদ !—ইঙ্কা চেঁচিয়ে হুকুম দিল—উৎসব চালাও, জোর উৎসব।

বেজে উঠল উটের চামড়ার বড় বড় নাগাড়া; তামার ঘণ্টা

টোঙা হাসিমুখে হাঁটু মুড়ে মাথাটি নুইয়ে বসল

অনবরত বাজতে লাগল ঢং ঢং ঢং। শিঙে আর হাড়ের বাঁশী ঘন ঘন গুমরে উঠল। পেতলের ঝাঁঝর বাজল ঝনন্ ঝনন্।

টোডা এরই মধ্যে হরিণখুশী ঝর্ণার ঠাণ্ডা জলে স্নান করে ফিরেছে। তাসমানি আর কিউথানি তার গায়ে যত্ন করে নানা রঙের আলপনা এঁকে দিল। টিগ্না মাঝি আদর করে একটা লাল কুঁচের মালা দিয়ে টোডার চুল গুছিয়ে বেঁধে দিল। মেড়া মিকির শজারু কাঁটার তৈরী একটা ঝালর দিল তার কোমরে জড়িয়ে। ভুংকা লুসাই ছুটো নীলা পাথরের মালা তার দু'পায়ে নূপুরের মত করে বেঁধে দিল। শুধু হুটেনটট্ ছিল চুপচাপ—মুখ ঘুরিয়ে মেঘগড়া পাহাড়ের চূড়োর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

বিলের পূবে নরম জমিতে ইঙ্কার হুকুম মতো সবাই মিলে দানাগুলো পুতে ফেলল। তারপর ইঙ্কা বজ্রের মত কড়া স্বরে ডাকল—

—টোডা পিরথম্ ধান্!—টোডা হাসি মুখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল; সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—

যাবার সময় তোমরা সবাই আমার দোষঘাট মাপ কর। তোমাদের আজ ছেড়ে চল্লাম, আবার ফিরব ফসল হয়ে। তখন তোমরা আমায় কত আদর করবে।

—টোডা পিরথম্ ধান্। আমার ডাক এল। বড় ইঙ্কা দাঁড়িয়ে আছে একখানা শানানো চকচকে তামার টাঙ্গি হাতে। পাথরের বেদীর ওপর সাপের মূর্তি দাঁড় করানো—সারি সারি বাটির মত সাজানো কতগুলো কচ্ছপের খোলা। টোডা হাসিমুখে হাঁটু মুড়ে মাথাটী নুইয়ে বসল। এক কোপে তার মাথা ধড় থেকে খুলে মাটীতে লুটিয়ে

পড়ল। টোডার কিনকি দিয়ে ঝরে পড়া গরম রক্ত কচ্ছপের খোলায় ভরে নিয়ে সবাই ক্ষেতের উপর ছড়িয়ে দিল। বড় ইঙ্কা রক্তমাখা টাঙি বুকে ছুঁইয়ে মন্তর পড়ল—

তেরু মেরু পেরু চুটি পটাক পাহাড়
ঈগলকি টেংরি আর কণ্ডর কি হাড়।
তুণ্‌দারা সাবাহানা প্রেরি প্রেরি—
দূর দূর দূর !
সিনাটি পাকাটি কাইবো কাইবো
আয় আয় আয় !
মাকড় ধোকড পুমা জাগুয়ার—
হঠ যাও হঠ যাও।
টর্‌ বুধো টর্‌ বুধো॥

চাষ পূজো শেষ করে ফিরবার সময় টট্‌ এক কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ক্ষেতের দিকে বল্লম তুলে চেঁচাতে লাগল—টোডার রক্ত খাবি তুই! চলে আয় দেখি!

মারে আর কি। সবাই হাঁ হাঁ করে দৌড়ে এসে তার হাত আর মুখ চেপে ধরে বলল···ছিঃ ছিঃ চুপ কর। অমন অলক্ষুণে কথা বলতে নেই টট্‌।

টোডা পিরথম্‌ ধানের রক্তে কিছুদিন পরে যে সবুজ ফসল ফলে উঠল তারি নাম ধান। সে ধানের কত খই, ভাত আর চাপাটী হল; সকলেই ফূর্ত্তি করে খেল। খেতে পায়নি শুধু টট্‌।

দেবতার গ্রাস

তোপচাঁচির ডেরায় বড় অশান্তি। নানান্ রকম উপদ্রব চলেছে ; তাই সবার মন ভরে রয়েছে উদ্বেগে। রোজ রাত্রে একটা জীব—অমাবস্থার টুকরোর মত ঘুটঘুটে তার গায়ের রং আর বিকেল বেলার ছায়ার মত পাতলা শরীর, জাড্ডার একচালার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। কখনো কখনো খুঁটিগুলোকে ঝাঁকানি দিয়ে পালিয়ে যায়। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত মানুষের গায়ে থুতু ফেলে দিয়ে যায় আর ভোর না হতে তার সমস্ত গা ফুস্কুরিতে ভরে ওঠে—সে কী যন্ত্রণা। টুডু সাঁওতাল বলে, এর নাম কালা ডাইন, ভয়ানক জীব। আরো বিপদ দেখা দিয়েছে ; মিকিরকে নেকড়েতে কামড়ে বিষ ঘা করে দিয়েছে, দু'একদিনের ভেতরেই বেচারা হয়তো মারা যাবে। তেষ্টার সময় ভেড়া নদীর বালি খুঁড়ে গভীর গর্ত্ত করেও এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না ; তোপচাঁচির বিলে বেলে হাঁসগুলো আর জল খেতে আসে না।

বাণ্টু ওঝা বড় দুঃখিত হয়ে একদিন বলল—ব্রাদার, সবাই একটু ভেবে দেখ তো ; কেউ কোন দোষ করেছ কি ? নইলে কোথায় গেল সে ? যে আকাশমায়ার জন্য দেশ ছেড়ে পাহাড় ডিঙিয়ে এলাম, সে কোথায় পালালো ? কদিন থেকে না দিচ্ছে সে দেখা, না শুনছি তার ডাক—না তার গায়ের সুগন্ধ। কে তাকে তাড়াল ?

বড় ইস্কা তখুনি ক্ষেত থেকে ফিরেছে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল—খবর খারাপ। এতদিন গেল এখনো গাছের চারা গজাল না।

তারপর চোখ পাকিয়ে কুড়ুল দিয়ে ঠকাং করে একটা পাথরকে ভীষণভাবে ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল—বন্ধুসব, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপের বড় ছেলে। আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি আর গায়ের জোর কারু নেই। সেই আমি বুঝতে পেরেছি এ অশান্তির কারণ কি? এর কারণ দেবতা রেগেছে—খুব রেগেছে; আর তাকে রাগিয়েছে একজন অপয়া, ঐ অপয়া হটেনটট্। ঐ না সেদিন ক্ষেতের ওপর বল্লম তুলেছিল, মনে পড়ে?

সকলে হটেনটটের দিকে তাকালো। জোড়া জোড়া চোখগুলো যেন জোড়া জোড়া সন্দেহের ছুরির মত তাকে তাড়া করে এল। কাণ্ড দেখে হটেনটটের মাথা গেল গরম হয়ে, তবু সামলে নিয়ে ধীর ভাবে বলল—তা হলে কি বলতে চাও বলে ফেল।

বড় ইঙ্কা গর্জ্জন করে বলল—দেবতা ছেড়ে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার জন্য পাপীকে অনুতাপ করতে হবে, অপয়াকে পুড়তে হবে। এই চাই।

টট্ বলল—বেশ, ব্যবস্থা কর।

বড় ইঙ্কা বুক ফুলিয়ে শিঙেয় ফুঁ দিতে সকলে সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল। হুকুম হল—

—একদল যাও জঙ্গলে, বড় দেখে একটা মাংসল জ্যান্ত জানোয়ার ধরে নিয়ে এস। —একদল আগুনের চক্র তৈরী কর। একদল হাতিয়ার নিয়ে নজর রাখ অপয়ার ওপর, যেন পালিয়ে না যায়।

হটেনটট্ খপ্ করে একটা টাঙ্গি নিয়ে নিজের পায়ের গোড়ালি দুটো দুকোপে কেটে ফেলে বলল—এই নাও, পালাব না; হল তো?

কোন সাড়া শব্দ নেই, নিথর নিস্তব্ধ। জঙ্গল থেকে জ্যান্ত জানোয়ার এসে তখনো পৌঁছয়নি। সাপের মূর্ত্তি খোদাই করা পাথরের বেদী ঘিরে সাজানো কুলকাঠে আগুনের চক্র দাউ দাউ করে জ্বলছে। বড় ইঙ্কা গম্ভীর ভাবে দূরে পায়চারি আর ছটফট করছে।

কাটা পা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। টটের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মুখে ব্যথা বেদনার চিহ্ন নেই। ভাঙা চাক ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মৌমাছির দুঃখে [illegible] সে আস্তে আস্তে গান গাইছিল—

জান্বেশী বড় দূর
জান্বেশী বড় কাছে।
তেমনি জলের ঢল, ছলছল সুশীতল
আছে আজো আছে।
ওরে আবার উড়ে যাবার
হাঁসের পালক নাচে!
জান্বেশী বড় দূর
জান্বেশী বড় কাছে।

ভেঙে-পড়া ঝড়ের মত ইঙ্কার শিঙে আবার গোঁ গোঁ করে বেজে উঠল; মস্ত একটা নীলগাই ধরে আনা হয়েছে।

—হুটেনটট্, দেবতার ভোগ চড়াও। হুকুম হল।

টট্ দুহাতে দেবতার নৈবেদ্য নীলগাইটাকে আকাশের দিকে তুলে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ে গিয়ে আগুনের চক্রের ভেতর ঢুকে পড়ল। বেদীর ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল দুটো প্রাণী। বাইরের উন্মত্ত নাচ, পেতলের ঝাঁঝর আর নাগাড়ার বাদ্যে নীলগাইয়ের আর্ত্তস্বর

টটু দুহাতে দেবতার নৈবেদ্য নীলগাইটাকে আকাশের দিকে
তুলে ধরে···আগুনের চক্রের ভেতর ঢুকে পড়ল

ডুবে গেল। আগুনের চক্র ঘিরে যোদ্ধারা বল্লম উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; চক্র ছেড়ে আধপোড়া হয়ে টট্ পালিয়ে না যায়। অনেকক্ষণ পরেও যখন টটের পালিয়ে যাবার লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বড় ইঙ্কা হুকুম দিল—বল্লম নামাও, আগুন নেভাও।

ছাইয়ের স্তূপ লগি দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখা গেল টট্ বা নীলগাইয়ের এক কুচো হাড়ও নেই। ইঙ্কা আনন্দে গদগদ হয়ে বলল—বাস্, আর ভয় নেই ; দেবতা খেয়েছে ভাল।

বাণ্টুর বিদায়

সিদ্ধিকাঠিটা দুহাতে বুকে জড়িয়ে বাণ্টু ওঝা জঙ্গলের ভেতর একা বসে কাঁদছিল। যত পুরানো দিনের কথা তার মনে পড়ছে। এমনি এক বিকেল বেলা গোরটিপির ওপর মাথা ঠুকে সে মনের ব্যথা জানিয়েছিল বুড়োবাবাদের কাছে। তারপর কোন এক আকাশমায়া তাকে তুক করে খেদিয়ে খেদিয়ে কোথায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেও যে আর দেখা দেয় না; তার বদলে সুরু হয়েছে কালা ডাইনের উৎপাত। রোগ, মরণ, খুন আর খাবার কষ্ট। তোপচাঁচির ডেরার যত হাসিখুসি বাসি ফুলের কেশরের মত খসে পড়ছে। বাণ্টু ওঝা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল।

ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে সে পাগলের মত বলল—কেন তুমি রাগ করেছ ? হে আমার আকাশমায়া, বনদেবী, জলপরী যে হও তুমি—তুমি এসো, তোমায় একবার ছুঁতে দাও। আমি কিছু চাই না, শুধু তোমার পায়ের গোলাপী আঙ্গুলে মুখ দিয়ে এক চুমুক মিষ্টি ঠাণ্ডা রক্ত পান করি—আমার সব তেষ্টা মিটে যাক। এস, এস, এস। রুম্ ব, রুম্ ব। ওঝা অবশ হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল।

ইঙ্কা আর টিগ্না শিকারে বেরিয়ে বাণ্টুকে এ অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল। ঠেলে তাকে উঠিয়ে প্রশ্ন করল—কি ওঝা ব্যাপার কি ?

বাণ্টু—এবার আমায় বিদায় দাও ভাই।

টিগ্না—সে কি কোথায় যাবে ?

বাণ্টু—আকাশমায়া আমায় ডেকেছিল, আমি যাইনি। সেই পাপে আমি ভুগছি! আমি কালই সেই গুহায় ঢুকব; তাকে ধরে নিয়ে সঙ্গে করে ফিরব! তখন দেখবে কারু কোন দুঃখ থাকবে না।

টিগ্না—বেশ তাই হবে। আমরাও সেই আশা নিয়ে তোমার অপেক্ষায় থাকব ওঝা।

ইঙ্কা আর টিগ্না দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

*

সবার আগে ঘুম ছেড়ে উঠেছে বাণ্টু ওঝা। সবে ভোর হয়েছে; বাণ্টু দুচোখ ভরে পৃথিবীকে যেন শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। দক্ষিণের ঘাস ছাওয়া মাঠে বেগুনী রঙের তারার মত ছড়িয়ে রয়েছে ছোট ছোট ফুল। ঠাণ্ডা বাতাসে মৌরীবনের সুগন্ধ আসছে ভেসে ভেসে। জঙ্গলের আস্তানা ছেড়ে তখন শুধু বনমুরগীর দল পাখা ঝাড়া দিয়ে কুর্‌র্ কুর্‌র্ শব্দ করে উড়ে চলেছে মাঠের দিকে, চীনে ঘাসের দানা খেতে।

বাণ্টু সবাইকে জাগাবার জন্য ডাকল—হো বন্ধুসব, ওঠ আমি প্রস্তুত।

চুপচাপ সব একে একে উঠে দাঁড়াল। ময়লা মুণ্ডা বলল—আজ বিদায়ের গান গাইব আমি। ওঝা, তুমি আগে আগে চল আর বাকী সবাই বাজনায় তাল দিয়ে পেছু পেছু এস।

বাণ্টু—একটু তাড়াতাড়ি কর ভাই। সূর্য্য উঠবার আগেই আমায় নেমে পড়তে হবে।

ময়লা মুণ্ডা সেদিন যে করুণ গান গাইল তেমনটী আর কোন দিন হয়নি। চোখের জল যেন শব্দ হয়ে গলা থেকে সুর ধরে বেরিয়ে এল।

গুহার মুখে পৌঁছে সব স্তব্ধ। বাণ্টু ওঝা দুপা এগিয়ে গুহাটার পাথরের খিলানের তলায় দাঁড়াল।

তাসমানি—ওঝা, আমার বুমেরাংটা সঙ্গে রাখ, বিপদে কাজ দেবে।

ওঁরাও—আমার টাঙ্গিটা নাও।

সাঁওতাল—গোটা কয়েক তীরের ফলা নাও ওঝা।

লুসাই—অন্ততঃ একটা মশাল নিলে ভাল হতো।

বাণ্টু—খুব খুশী, খুব খুশী। আমার ওসব কিছুই চাই না। ঐ দেখ গাছের মাথা রাঙিয়ে উঠেছে, সূর্য্য উঠল বলে। বন্ধুসব এবার আমি যাই।

সকলে সমস্বরে বলল—যাও ওঝা যাও; আমরা তোমার পথ চেয়ে রইলাম। রোজ আমরা আসব এখানে। তুমি যেদিন তাকে নিয়ে ফিরবে সেদিন আমরা তোমাদের কাঁধে চড়িয়ে ঘরে নিয়ে যাব।

ঢাক বাঁশী আর ঝাঁঝরের বাজনা চলল; বাণ্টু ওঝা গুহার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পৃথিবীর অদলবদল

কতদিন যে গেছে বলা যায় না ; পৃথিবীর অনেক অদলবদল হয়ে গেছে। কোথাও সমুদ্দুর শুকিয়ে চড়া পড়ে গেছে ; কোথাও মরুভূমি বানের তোড়ে ভেসে সাগর হয়ে গেছে। কত আগুনমুখী পাহাড় ছাই চাপা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ; ভূমিকম্পে কত মেঘঠেকা পাহাড়ের চূড়ো খসে পড়ে ধূলো হয়ে গেল। একবার একটা হিমেল হাওয়ার বান বয়ে গেল মাঝ পৃথিবীকে পাক দিয়ে। যে যে জন্তু আর মানুষ পারল, গেল পালিয়ে। বাকী সব মরে গিয়ে হাড় কঙ্কালের শ্মশান করে রাখল। আবার কোত্থেকে সুরু হল ঝড়—সমুদ্রের জল আছড়ে আছড়ে আকাশের মেঘ জড়ো করল। মেঘ উড়ে এসে নেড়া রোদ্দুর ফাটা দেশগুলো সব বৃষ্টিতে ভিজিয়ে নরম করে দিল। আবার ঘাস গাছ লতা ফুল ফুটে উঠল সেখানে—দেশ ভরে গেল পাখীর গানে।

জলের বান, হিমের বানের মত মানুষের বান পৃথিবীময় গড়িয়ে গেল। মানুষ পালায় আবার আসে। নতুন মানুষ এসে পুরাণো মানুষে মিশে যায়। এই রকম কত তোলপাড় চলল—শুধু আকাশের চন্দ্র সূর্য্য তারা রইল অবিচল। এ ইতিহাস তারাই শুধু ঠিক ঠিক বলতে পারে।

নতুন মানুষের গল্প

বরাকর গোবিন্দপুর রাজগঞ্জ আর তোপচাঁচির বস্তি ছুঁয়ে যে রাজপথ বরাবর উত্তর-পশ্চিম মুখে চলে গেছে, সেই হলো ভারতের বিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। সুন্দর রাস্তাটী; কোথাও লাল কাঁকর আর সাদা পাথরের খোয়া দিয়ে চৌরস করা; কোথাও আবার কালো পিচ ঢালাই করা। দুপাশে রাজপ্রাসাদের দীপস্তম্ভের মত সারি সারি শিশু, ঘোড়ানিম, আম আর বকুল গাছ। মাঝে মাঝে এক একটী বুড়ো বট বা অশথ—তলায় একটী করে পাতকুয়ো।

এ পথে পথিকের চলাচল খুব। বড় বড় যাত্রীবোঝাই বাস অনবরত গয়া-টু-ধানবাদ, বরাকর-টু-হাজারিবাগ যাওয়া আসা করে। সদাগরেরা কানপুরী ছাগলের পাল চরিয়ে এই পথে কলকাতায় নিয়ে যায়। শোণপুরের মেলা থেকে দুধেল গরু আর মোষ কিনে বর্দ্ধমানের গয়লারা এই পথে বাড়ী ফেরে। তা ছাড়া হাটুরে টুরিষ্ট, কয়লাখাদের কুলীর বিয়ের বরযাত্রীদল, টাট্টুচড়া শিখ সাধুর দল, কণৌজী আতরওয়ালা, জৈনী লেংটাবাবা, হিংবেচা কাবুলী আর চীনে সিল্ক ফিরিওয়ালা—এ সবই এ পথে দেখতে পাওয়া যায়।

রাজগঞ্জের বাজারে সকলেই একটু আধটু বিশ্রাম করে। বাজার থেকে একটা কাঁচা সড়ক সোজা সিমেণ্টের খাদ ও কারখানা পর্য্যন্ত চলে গেছে। রোডে দাঁড়িয়ে কারখানায় চিমনির ধোঁয়া, আখ, অড়হরের ক্ষেত আর গরুচরা মাঠ দেখা যায়। কারখানার ওপারে আর কিছু

দেখা যায় না, নেড়া জোড়পাহাড়টা সব আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

সিমেণ্টের খাদে নতুন একদল বিলাসপুরী কুলি এসেছে। মুন্সী রামশরণ সন্ধ্যের হাজিরা নেবার জন্যে ধাওড়ায় এসে ডাকল—তুরঙ্গ সিং!

একজন কুলি বেরিয়ে এসে বলল—তুরঙ্গ সিং তার পোষা বাছুরটার খোঁজে বেরিয়েছে।

মুন্সী—জোড়পাহাড়ের দিকে গেছে বোধ হয়?

কুলী—জী হাঁ মুন্সী জী।

মুন্সী রামশরণ মুখ গম্ভীর করে বসল। একে একে কুলিরা এসে জুটতে লাগল। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে দেখে একজন একটা কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে গেল। মুন্সীকে চিন্তিত দেখে কুলিরা জিজ্ঞাসা করল—কোন ভয়ের কারণ নেই তো মুন্সীজী? একা তুরঙ্গসিংকে যদি এই রাত্তিরে কোন জানোয়ার টানোয়ার···।

মুন্সী বাধা দিয়ে বলল— জানোয়ার ফানোয়ার নয়। তার চেয়েও ভয়ানক আছে। আজ বেকুবটা বেঁচে এলে হয়।

ভয়ে বিবর্ণ কুলিরা হাঁ করে মুন্সীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের আরো ফ্যাকাসে করে দিয়ে মুন্সী বলল—বুড়াপ্রেত, বুড়াপ্রেত। জোড়পাহাড়ের বুড়াপ্রেত। বাজারের আর গাঁয়ের ছেলেরা, নাতিরা, ঠাকুর্দ্দারা সবাই একবার না একবার তাকে দেখেছে। অনেকে তার হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছে শুধু দাঁতকপাটি লেগে। কেউ কেউ সত্যি মারাও পড়েছে।

কুলিরা শিউরে গিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। হতভাগ্য তুরঙ্গসিংএর কথা একবার স্মরণ করল।

মুন্সী—বুড়াপ্রেতের কীর্ত্তি যদি একবার শোন তবে বলবে হাঁ প্রেত বটে! সাংঘাতিক প্রেত!

আমি একবার ইয়া তনদুরুস্ত একটা ময়না পুষেছিলাম। ছেড়ে দিলেও পালাতো না। সমস্ত দিন উড়ে উড়ে ঠিক সন্ধ্যেয় খাঁচায় ফিরে আসত। কী সুন্দর পড়তে পারত পাখীটা—

ভর্ দে বাবা ভর্ দে বাবা
সীতারামকা ঝোলা
চানাভি থোড়া গুড়ভি থোড়া
মঁয় রামশরণকা চেলা।

একদিন ময়নাটা দেরী করে ফিরল। আদর করে বললাম—চুঃ চুঃ বোল, বেটা বোল, ভর্ দে বাবা ভর্ দে বাবা। শুধু ছটফট করে পাখা ঝাড়তে লাগল, একটা শব্দও করল না। সেই থেকে পাখীটা বোবা হয়ে গেছে।

বাজারের পাগলা পাণ্ডাকে দেখেছ তো? ঐ যে কম্বলের আলখাল্লা পরে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, কপালে একটা রাংতা সেঁটে বসে বসে ফিক্-ফিক্ করে হাসে। ওরি নাম দুর্গাপদ পাণ্ডা; তিনটী মৌজার মালিক, কী সুন্দর সংসারী লোক ছিল। একদিন সজারু শিকার করবে বলে জোড়পাহাড়ের বনে মাচান বেঁধে সমস্ত রাত বসে ছিল। সকালে ফিরল পাগল হয়ে।

এই কারখানার বয়লট একদিন বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ! মিস্ত্রিরা

পরীক্ষা করে দেখল কোথাও একটু গলদ নেই ; কিন্তু বয়লট কিছুতেই ষ্টীম নিল না। বুঝলাম এসব বুড়োপ্রেতের ছল, তাকে তুষ্ট করতে হবে। একদিন পূজো করে জোড়াছাগল বলি দিয়ে মুড়ো দুটো জোড়-পাহাড়ের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসা হল। সেই থেকে বয়লট ও চলল হুস্ ফুস্—ধকা ধক্।

এক খুব পয়সাওয়ালা মাড়োয়ারি শেঠজী একবার জোড়পাহাড়ের সাবাই ঘাস আর বাঁশের জঙ্গল সস্তায় ইজারা নিলে। ভাবলে দাঁওয়ের ওপর দুপয়সা পিটে নেবে। নেপালী দারোয়ান নিয়ে টিনের চালা বেঁধে সে কাছাকাছি পলাশের বাগিচাটায় থাকত। একদিন সকালে দেখা গেল ভুঁড়ি চুপসে শেঠজি মরে পড়ে আছে—গলায় পাঁচটা বড় বড় আঙ্গুলের দাগ

শুনতে শুনতে কুলীদের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। তারা বলল—মুন্সীজি, তুরঙ্গ সিং কিন্তু এখনো ফিরল না।

বুড়াপ্রেত

উন্মত্ত ঝড়ের মত তুরঙ্গ সিং দৌড়ে উপস্থিত। উসকো খুসকো চুল, কাপড় জামা ছিঁড়ে গেছে। হাপরের মত বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠছে নামছে। ভীষণ ভাবে চেঁচিয়ে তুরঙ্গ সিং বলতে লাগল—আসছে, আসছে। শীগগির কর। শীগগির নিয়ে এস বন্দুক, লাঠি, তলোয়ার, হাতুড়ি, পেরেক, ঝাড়ু…।

মুন্সী রামশরণ ধমক দিয়ে বলল—কি আবোল তাবোল বকছ? কিসের বন্দুক হাতুড়ি ঝাড়ু?

—বুড়াপ্রেত। বলেই তুরঙ্গ সিং আর্ত্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কুলিরা তাকে হাওয়া করে সুস্থ করতে লাগল।

তারপর সে কী চীৎকার আর ছুটাছুটি। রাজগঞ্জের বাজারের আর পাশের গাঁয়ের লোকেরা লাঠি সোটা নিয়ে দৌড়ে সিমেণ্টের কারখানার ফটকে জমায়েত হতে লাগল। ব্যানার্জী সাহেব একটা লম্বা টর্চবাতি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন; পাশে রইল তাঁর খানসামা দাঁড়িয়ে, এল জি বুলেটভরা দোনলা বন্দুক নিয়ে। জনতার মুখে একসঙ্গে ভয় কৌতূহল আর প্রতিশোধের স্পৃহা তিন রকম ভাব ফুটে উঠেছে।

তুরঙ্গ সিং চেঁচিয়ে উঠল—ঐ ঐ আসছে। ব্যানার্জী সাহেব টর্চবাতি টিপলেন; তীরের মত আলো মাঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। অনেক দূরে অস্পষ্টরকম কি দেখা গেল; ঠিক বোঝা গেল না।

একটু পরে দেখা গেল সত্যই কে একজন আসছে। কুলিমজুর,

কেরানী, মেথর আর দোকানী সকলে ভয়ে সাঁটাসাটি হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল।—সে আসছে ; এই এবার অড়হর ক্ষেত থেকে নেমেছে ; এই উঠল আখের ক্ষেতের আলের ওপর। এবার নতুন পুকুরের কিনারা ধরে—আসছে ; এই এল বলে। কারখানার ছোট ফটকের কাছে সুরকি বাঁধানো রাস্তার ধারে বাতাবী নেবুর গাছটার কাছে এসে দাঁড়াতেই সকলে স্পষ্ট দেখল—বুড়াপ্রেত।

কী বীভৎস চেহারা। সমস্ত মাথার চুল, মায় ভ্রূ আর গায়ের রোঁয়া পেকে শনের মত সাদা। শালগ্রাম পাথরের মত কুচকুচে কালো গায়ের রং ; সমস্ত চামড়া যেন গিলে দিয়ে কুঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝুলে পড়া মোটা ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকা মাড়িতে দুচারটে খুঁটোর মত দাঁত দেখা যাচ্ছে। কোটরের ভেতর থেকে চোখ দুটো ঠিকরে রয়েছে বাইরে ; মরা কাতলা মাছের মত স্থিরদৃষ্টি। হাত পা গুলো নড়বড়ে, ঘুণধরা বাঁশের মত।

বানার্জী সাহেব প্রথম সাহস দেখালেন। বললেন—মারো।

—গুড়ুম। খানসামার হাতের বন্দুকের গুলি ছুটে বুড়াপ্রেতের ঠিক বুকে গিয়ে বিঁধল। একটা গোঙানি দিয়ে বুড়াপ্রেত বাতাবী গাছটাতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। সকলে এবার আশ্চর্য্য হয়ে দেখল বুড়াপ্রেত হাত তুলে ইসারা করে ডাকছে।

ভীড়ের মধ্যে একদল রাখাল ছোকরা ছিল, তারা বলল—এই সেই, আমরা যাকে জঙ্গলে দেখেছিলাম। তবে আমরা রাম নাম করে পালিয়ে বেঁচেছিলাম।

মুন্সী রামশরণ—চট্ করে গুলি করা উচিত হয় নি।

গুড়ুম—খানসামার হাতের বন্দুকের গুলি ছুটে বুড়াপ্রেতে
ঠিক বুকে গিয়ে বিঁধল

একজন ফিরিঙ্গি মোটরবাস ড্রাইভারও সেই ভীড়ের মধ্যে ছিল। সে একটু রাগ করেই বলল—গুডনেস্! বুড্ঢার জখম থেকে কী ভীষণ রক্ত ঝরছে। আরে, ওটা একটা মানুষও তো হোতে পারে! হয় তো কোন বুড়ো ভ্যাগাবণ্ড। একে গুলি মারা, ছোঃ, ননসেন্স।

ড্রাইভার সাহেবের কথায় জনতার মধ্যে যেন একটু কাণ্ডজ্ঞান ও সাহস ফিরে এল। সবাই একবাক্যে বলতে লাগল—চল সব এগিয়ে গিয়ে শুনি ও কি বলতে চায়। ড্রাইভার সাহেব সাহস করে প্রথমে এগিয়ে গেল, পেছনে আর সব। ব্যানার্জী সাহেব সব চেয়ে বেশী ভয় পেয়ে বাংলোতে চলে গেলেন।

কাছে গিয়ে দেখা গেল অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোছের একটা লোক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। একটা ঢোঁক গিলে ক্ষতস্থানটা বাঁ হাতে চেপে বলল—বসো, বসো তোমরা সব। বড় দুঃখের বিষয় অচেনা কাউকে দেখলেই মেরে ফেলতে হবে এ কুঅভ্যাস তোমাদের এখনো যায় নি। গুলি করে না মারলেও আজ আমি মরতাম। নিজেই চলে যাচ্ছিলাম বরাকরের স্রোতের দিকে—ভেসে যাব মনে করে।

তখন সপ্তমীর চাঁদ আকাশে উঠে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে, বুড়ো সেই দিকে চেয়ে একটু চুপ করে বলল—আচ্ছা, তারা সব গেল কোথায় বলতো? কথা ছিল আমার আসা পর্য্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। কতদিন ধরে তাদের খুঁজছি কিন্তু কোন ঠিকানা পেলুম না। তোমাদেরও এতদিন জিজ্ঞাসা করতে পারি নি, কারণ দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যেতে।

তারা আজ আমায় দেখে কত খুশী হতো আর তোমরা—তোমরা আমায় মারতে এগিয়ে এসেছ। আমাকে বল বুড়াপ্রেত! বুড়ো একটু হাসল।

মুন্সী রামশরণ মাপ চাওয়ার মত মিনতি করে প্রশ্ন করল—হে বুড়া আমাদের ভুল হয়েছে, কিন্তু তুমি কাদের কথা বলছ? কাদের খুঁজছ?

বুড়ো—এই ধরো, টুডু সাঁওতাল!

মুন্সী—টুলু সরকার একজন আছে বটে!

বুড়ো—না, না, সে নয়। আচ্ছা, ভুংকা লুসাই?

তুরঙ্গ সিং—ঠিক ও নামে কেউ নেই, তবে ভূধর গোঁসাই একজন আছে।

বুড়ো—আর, বেঁটে তাসমানি?

মুন্সী—বটুকনাথ শ্রীমানি একজন ছিল, রাণীগঞ্জ চলে গেছে।

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—যাক বুঝলাম, তারা আর কেউ নেই। তোমাদের এক একজনের মুখ দেখে আমার সেই পুরানো মিতের মুখ মনে পড়ছে—ইঙ্কা, টিগ্না, মিকির—ওঃ! আজ যদি তারা থাকতো—তাদের শুধু এইটুকু জানিয়ে যেতাম যে, সে আকাশমায়া ধরা দিল না।

বুড়োর কথায় জনতার আগ্রহ বেড়ে গেল। তারা বলতে লাগল—মুন্সীজি জিজ্ঞাসা করুন তো, আকাশমায়া না কি তো বলছে, তার মানে কি?

বুড়ো শুনতে পেয়ে বলল—ভাই সব, তোমাদেরও বলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি তো একটা প্রেত ......।

সকলে বাধা দিয়ে বলল—না, না, তুমি প্রেত হতে যাবে কেন ? তুমি প্রেত নও।

বুড়ো যেন একটু ঠাট্টা করে বলল— তবে আমি কি ?

কোমরে ঘুনসি বাঁধা ন্যাংটো একটা ছোট্ট ছেলে—বাজারের মুদীর ছেলে—বাপের হাত ধরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল আর শুনছিল। চট্ করে সে উত্তর দিল—তবে তুমি দাদু !

জনতা হেসে উঠল হো হো করে। বুড়োর ঝামানো মুখে একটা মিষ্টি হাসির ছায়া খেলে গেল।

বাতাবী গাছের পাতার ফাঁকে বুড়োর মুখে এক ঝলক চাঁদের আলো পড়েছে। বুড়ো চোখ দুটী বন্ধ করে আস্তে আস্তে বলতে লাগল—

আমি এক আকাশমায়াকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তার গায়ের সুগন্ধ এই বাতাবী কুঁড়ির গন্ধের চেয়েও মিঠে ; তার গলার স্বর নুড়ির ওপর গড়িয়ে যাওয়া পাহাড়ী ঝর্ণার চেয়েও নরম। একদিন রাত্রে তাকে দেখলাম সে বসে রয়েছে, মুখের হাসিটী চিক চিক করে জ্বলছে। তাড়া করতেই পালিয়ে গেল গুহার অন্ধকারে। সেই অন্ধকারের রাজ্যেও তার পেছু ধাওয়া করে ফিরলাম—কত কত দিন জানি না ; কিন্তু সে ধরা দিল না।

বুড়োর—গলার স্বর অত্যন্ত মৃদু হয়ে এল। একটা ঢোঁক গিলে যেন সে নিঃশ্বাসটা আটকে রাখল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল—

আকাশমায়াকে ধরতে যদি চাও তবে আকাশের চেয়ে সুন্দর একটী ফাঁদ পাত পৃথিবীতে। ফাঁদের সুমুখে বসিয়ে দিও রামধনুর চেয়ে

সুন্দর একটী তোরণ। সাদা সোণালী আর সিঁদূরে মেঘের চেয়েও চোখ জুড়োনো গুচ্ছ গুচ্ছ মালতী চাঁপা আর কৃষ্ণচূড়ার মালঞ্চে তাকে ঘিরে রেখ। রূপোলি জালে মোতির চুমকি বসিয়ে চাঁদোয়া টেনে দিয়ো, যেন আকাশের তারার জাল তার কাছে হার মানে। সেই ফাঁদের ভেতর এক লতাকুঞ্জের আড়ালে বসে তোমরা গলাগলি করে বসবে—গান গাইবে আকাশের রাজহাঁসের চেয়ে মিঠে সুরে। তোমাদের হাসিখুসির ফোয়ারা ছুটবে মাটী থেকে আকাশে। কুয়াসার চেয়েও সুন্দর—ছোট ছেলের স্বপ্নের মত হাল্কা ধূপের ধোঁয়ায় ফাঁদকে ঢেকে রেখ। হেনার গন্ধে হাওয়াকে দিও ভরে। তখন দেখবে, আকাশমায়া আর থাকতে পারবে না; নেমে এসে ধরা দেবে। সে সকলকে ভুলিয়ে বেড়ায়, তোমরা তাকে ভোলাও তাকে ভোলাও। সব দুঃখু মিটে যাবে। তোমাদের সেই সুদিন ঘনিয়ে আসুক তাড়াতাড়ি।

এইবার দাদারা, আমায় একটু গান শোনাও।

রাখাল ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে মাদল আর বাঁশী নিয়ে এল। মাদল বেজে উঠল—দিপির দিপাং, ধিতাং ধিতাং। রাখাল ছেলেরা ঝুমুরের তালে গান ধরল—

নদীর ধারে চিট মাটি পাথর ভেঙেছে,
আংনাতে ঝিঙাফুল, ফড়িং লেগেছে।
সে এইসেছে, সে এইসে নাই
লজরেতে এইসে নাই······গো।

গান থামল; গানের প্রতিধ্বনি ফিরতে লাগল পাহাড়ে পাহাড়ে। রাখাল ছেলেরা ডাকল—দাদু! দাদু!

কোন সাড়া নেই ; হাজার বছরের বুড়োর হাসি কান্না এইবার চিরকালের জন্য থেমে গেছে ।

সপ্তমীর চাঁদ হেলে পড়েছে, বনের কোণে। সকলে অবাক হয়ে দেখল, পরীর মত ধবধবে সাদা সাজগোজ করা কে যেন বাতাবীর পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। বুড়োর কোলের ওপর ঝরিয়ে দিল একরাশ সাদা সাদা কুঁড়ি ; তারপর উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

জনকয়েক লোক চেঁচিয়ে উঠল—আরে ঐ যে বুড়োর আকাশমায়া ; ধর ধর ধর।

রাখাল ছেলেরা—চুপ চুপ ! ফাঁদ পেতে ধরতে হবে।